ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454–1508

Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1092-1099

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: https://www.atmadeep.in/

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.109

নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশুপ্রেম

ড. কৌশিকোত্তম প্রামানিক, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 26.05.2025; Send for Revised: 26.05.2025; Revised Received: 27.05.2025; Accepted: 28.05.2025; Available online: 31.05.2025

Abstract

In recent decades, we have seen many confrontations between man and wild animal. Our activities and actions are responsible for making animal in compulsion with inevitable confrontation. Lack of food, existential crisis makes them so furious. But there is a little space in the world where man fells love and affection for animals. For this reason, the story writers can not ignore and avoid this. They depict this type of affection vividly in their short stories, at their best level. Like other literatures Bengali literature can not be apart from this area, we find so many short story writers who became so popular by writing this type creation. In this context, we recall the renowned Bengali short story writers and their immemorable short stories like 'Mahesh', 'Adorini', 'Lambokorno', 'Kalapahar', 'Nari o Nagini' and 'Goghno' etc. Thease short stories have shown unselfish love between man and animal besides reflection of society.

Keywords: Affection, Love, Creativity, Refection of society, Releationship

পৃথিবী সৃষ্টি আদি থেকেই মানুষের সাথে মানুষের ভালবাসা দেখতে পাওয়া যায়। এই ভালবাসা শুধুমাত্র মানুষ থেকে মানুষে সঞ্চারিত হয় নি, এই ভালবাসা সঞ্চারিত হয়েছে মানুষ ও পশুদের মধ্যেও। স্বাভাবিক ভাবেই সাহিত্যেও উঠে এসেছে মানব ও পশুর চিরন্তন প্রেম। বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যে যেমন পশু ও মানবের প্রেম, সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে তেমনি বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পকারদের রচনায় পশু ও মানবের প্রেম সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আধুনিক কালের ছোটগল্পকারদের মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে অতি অবশ্যই যে সব ছোটগল্পকারদের নাম উঠে আসে তাঁরা হলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়(১৮৭৩-১৯৩২), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়(১৮৭৬-১৯৩৮), রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০), তারাশঙ্কর বন্ধ্যোপাধ্যায়,(১৮৯৮-১৯৭১) সৈয়দ মুজতবা সিরাজ, (১৯৩০-২০১২) প্রমুখেরা। পশুপ্রেম বিষয়ে তাঁদের রচিত গল্পগুলি হল, যথাক্রমে- ১) মহেশ (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) ২) আদরিনী (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়) ৩) লম্বকর্ণ(পরশুরাম ছদ্মনামে রাজশেখর বসু) ৪) কালাপাহাড়(তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়) ৫)নারী ও নাগিনী(তারাশঙ্কর বন্ধ্যোপাধ্যায়) ৬) গোঘ্ন (সৈয়দ মুজতবা সিরাজ)

প্রথমেই শুরু করা যাক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পটির মধ্য দিয়ে। গল্পের প্রধান চরিত্র জয়কালী। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখক লিখেছেন-

> *"জয়কালী দীর্ঘিকার দৃঢ়শরীর তীক্ষ্ণনাসা প্রখর বুদ্ধি স্ত্রীলোক। তাঁহার স্বামীর অবর্তমানে তাহাদের দেবোত্তর সম্পত্তি নষ্ট হইবার জো হইয়াছিল। বিধবা তাহার সমস্ত বাকি বকেয়া আদায়,*

> *সীমাসরহদ্দ স্থির এবং বহুকালের বেদখল উদ্ধার করিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাপ্য হইতে কেহ তাহাকে এক কড়ি বঞ্চিত করিতে পারিত না।''*[১]

জয়কালীর চারিত্রিক গঠন যেমন একদিকে কঠিন ছিল অন্যদিকে তেমনি আবার স্নেহ, প্রেম, ভালবাসায়ও পরিপূর্ণ ছিল। এই বিধবার ঠাকুর বাড়ি, মন্দির ছিল তাঁর সমস্ত সংসার। কোনরকমের শৈথিল্য তিনি বরদাস্ত করতেন না। এমনকি বাইরের লোক তো দূরের কথা, নিজের আত্মীয় স্বজনদেরও ছিল এই মন্দিরে প্রবেশের অনধিকার। এই দেবালয়েই একদিন ঘটে যায় এক অভূতপূর্ব ঘটনা। বলি হবার পূর্বে ডোমের দলের তাড়া খেয়ে একটি শূকর প্রাণভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে দেবালয় প্রাঙ্গণে। মন্দিরের পুজারি শূকরটিকে তাড়া করতে যায়, কিন্তু জয়কালী বাঁধা দেন। পশুটিকে তিনি আর ডোমেদের হাতে তুলে দেন না। প্রাণভয়ে তাড়িত এক পশুর জন্যে জয়কালীর অন্তরে নির্মল মমতাবোধ জেগে উঠে। সকলে অবাক হয়ে যায় কর্তব্যে কঠিন জয়কালীর এই আচরণে-

> *''জয়কালী রুদ্ধদ্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিলেন, যা বেটারা, ফিরে যা! আমার মন্দির অপবিত্র করিসনে।*
>
> *ডোমের দল ফিরিয়া গেল। জয়কালী ঠাকুরানী সে তাঁহার রাধানাথ জীউর মন্দিরের মধ্যে অশুচি জন্তুকে আশ্রয় দেবেন, ইহা তাহারা প্রায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিল না।''*[২]

পশু প্রেমের উল্লেখ রয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' ও 'সুভা' গল্পেও। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মৃণালের পশুপ্রেমকে তার শ্বশুরবাড়ীর মানুষেরা সহ্য করতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কথাকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে ভালোবাসা যে কত প্রগাঢ় হয়, তার অন্যতম উদাহরণ হল তাঁর রচিত 'আদরিণী' গল্পটি। গল্পের প্রধান চরিত্র মোক্তার জয়রাম মুখোপাধ্যায়। অভিমানী কিছুটা বদরাগী কিন্তু স্নেহে বাৎসল্যে তার ভরাট হৃদয়। পীরগঞ্জের মেজবাবুর মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে তিনি ও তার বন্ধুদের সাথে ঠিক করেছেন বিয়ের নিমন্ত্রণ তিনি রক্ষা করবেন হাতিতে চড়ে। মোক্তার হিসাবে তার সাথে পার্শ্ববর্তী মহারাজ নরেশচন্দ্রের ভালো সুসম্পর্ক থাকার সুবাদে তিনি মহারাজকে হাতি পাঠাবার জন্য পত্র লিখেছিলেন। পত্রবাহক ফিরে এসে জানায় মহারাজ হাতি দিতে অস্বীকার করেছেন। দেওয়ানজী মারফত পত্রবাহককে শুনিয়ে দেওয়া হয়-''বিয়ের নেমতন্ন হয়েছে তার জন্যে হাতী কেন? গরুর গাড়িতে আস্তে বোলো।''[৩] একগুয়ে জয়রামের জেদ চেপে যায়, তিনি ঠিক করেন হাতীতে চেপেই তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবেন নতুবা যাবেন না।সেই রাতেই তিনি বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর থেকে দুই হাজার টাকা দিয়ে একটি মাদী হাতি কেনেন। নাম রাখেন আদরিণী। হাতির পিঠে চেপেই তিনি অবশেষে নিজের জেদ ও সম্মান বজায় রাখেন।

পাঁচ বছর পর মোক্তার জয়রাম বাবুর ভাগ্য উল্টোদিকে হাটতে থাকে। তার অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমে ভেঙ্গে পড়ে। নবীন শিক্ষানবিস ইংরেজি জানা উকিলদের সাথে তিনি প্রতিযোগিতা করতে পারেন না। উপার্জনে ভাঁটা পড়ে।অবসর গ্রহনের উপযুক্ত বয়সও হয়ে যায়। একসময় তিনি কাছারী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অন্যদিকে সাংসারিক ব্যায় ক্রমে উর্ধ্বমুখী হতে থাকে। তার প্রথম দুটি পুত্র মূর্খ উপার্জনহীন, ছোটছেলে কলকাতায় ফেল করেছে, বরবধূ, মেজবধূ উভয়েই অন্তঃসত্ত্বা, বিবাহযোগ্যা বড় পৌত্রী কল্যাণী, এই সকল সাংসারিক সমস্যায় জয়রাম মুখোপাধ্যায় জর্জরিত।এইরকম পারিবারিক অর্থনৈতিক দুরাবস্থায় তাঁর অনেক হৈতেষী বন্ধুই পরামর্শ দেন আদরিণীকে বিক্রি করে দেবার। প্রথম দিকে তিনি বন্ধুদের এই প্রস্তাবে দুঃখিত হন-''তার চেয়ে বল না তোমার এই ছেলেপিলে নাতি-পুতিদের খাওয়াতে অনেক টাকা ব্যায় হয়ে যাচ্ছে- ওদের একে একে বিক্রী করে ফেল।''[৪] কিন্তু পৌত্রী কল্যাণীর বিয়ে ঠিক হলে, পণ স্বরপ বরপক্ষকে আড়াই হাজার টাকার দরকার। টাকা জোগাড় করতে একসময়ের একগুয়ে অর্থবান প্রতাপশালী জয়রাম বাধ্য হয়ে আদরিণীকে বামুন হাটের চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেন। ভগ্নহৃদয় জয়রাম আদরিণীকে মেলায় বিদায় দেবার পূর্বে তার গলায় হাত বুলিয়ে বলেন- ''আদর, যাও মা, বামুনহাটের মেলা দেখে এস।''[৫] তিন হাজার টাকায় বিক্রি করার মত খরিদ্দার বামুন হাটের মেলায় পাওয়া যায় না। আদরিণীকে ফিরে আসতে হয় জয়রামের বাড়িতেই। অন্যদিকে কল্যাণীর বিয়েরও বেশী দিন বাকী নেই। এবার আদরিণীকে রসুলগঞ্জের মেলায় পাঠানোর ব্যাবস্থা করা হয়। এবার দুঃখে ভারাক্রান্ত জয়রাম আদরিণীর

সাথে বিদায়ের পূর্বে আর দেখা করলেন না।নাতনীর মুখে তিনি শুনতে পান যাবার সময় আদরিণীর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। তিনি নিজ মনে সগতোক্তি করেন-

> *"যাবার সময় আমি তোর সঙ্গে দেখা করলাম না - সে কি তোকে অনাদর করে? না মা, তা নয়। তুই ত অন্তর্যামী - তুই কি আমার মনের কথা বুঝতে পারিস নি? - খুকীর বিয়েটা হয়ে যাক। তার পর তুই যার ঘরে যাবি, তাদের বাড়ি গিয়ে আমি তাকে দেখে আসব। তোর জন্যে সন্দেশ নিয়ে যাব।- রসগোল্লা নিয়ে যাব। যতদিন বেঁচে থাকব, মনে কোনও অভিমান করিসনে মা।"*[৬]

রসুলগঞ্জের মেলায় যাবার পথে আদরিণী অসুস্থ হয়ে পড়ে। একজন চাষি পত্রবাহকের মাধ্যমে জয়রাম জানতে পারেন। অসুস্থতার খবর তাকে বিচলিত ও অস্থির করে তুলে-

> *"আমার গাড়ির বন্দোবস্ত করে দাও। আমি এখনি বেরুব। আদরের অসুখ- যাতনার সে ছটপট করছে। আমাকে না দেখতে পেলে সে সুস্থ হবে না। আমি আর দেরী করতে পারব না।"*[৭]

যখন জয়রাম পৌঁছান আদরিণীর কাছে, ততক্ষণে আদরিণী শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছে। মানুষ ও পশুর স্নেহ ও ভালোবাসা যে কত উচ্চতায় পৌঁছে গেছে তা গল্পের শেষ কয়টি লাইনে লেখক সুনিপুণ ভাবে বর্ণনা করেছেন-

"বৃদ্ধ ছুটিয়া গিয়া হস্তিনীর শবদেহের উপর লুটাইয়া পড়িয়া, তাহার মুখের নিকট মুখ রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বারম্বার বলিতে লাগিলেন-অভিমান করে চলে গেলি মা? তোকে বিক্রি করতে পাঠিয়েছিলুম বলে- তুই অভিমান করে চলে গেলি?"[৮]

এরপর জয়রাম শুধুমাত্র দুই মাস বেঁচেছিলেন।

পশুপ্রেমমূলক গল্প শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত 'মহেশ' সর্বজনবিদিত। গল্পটিকে কেন্দ্র করে লেখক একদিকে যেমন পশুর প্রতি মানুষের হার্দিক ভালোবাসার পরিচয় রয়েছে, ঠিক তেমনি অন্যদিকে রয়েছে সমাজের প্রতি লেখকের নির্মম ব্যঙ্গ। সমাজ বিদীর্ণ হয়েছে লেখকের ব্যঙ্গবাণে। গল্পের শুরুতেই লেখক এক সামন্ততান্ত্রিক জমিদার তন্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন-

> *"গ্রামের নাম কাশীপুর। গ্রাম ছোট, জমিদার আরও ছোট, তবু দাপটে তাঁর প্রজারা টু শব্দ করিতে পারে না- এমনই প্রতাপ"*[৯]

এই ব্রাহ্মণ জমিদারের 'সীমানার পথের ধারে গফুর জোলার বাড়ি।' সুতরাং এই ম্লেচ্ছ গফুরকে যে জমিদারের চাপে থাকতে হয় একথা বলাবাহুল্য। গফুরের একটি ষাঁড়ের প্রতি ভালোবাসার নাম 'মহেশ'। মহেশকে কেন্দ্র করেই লেখক তাঁর অভাবনীয় শিল্পকুশলতায় গল্পটিকে রসোত্তীর্ণ করেছেন। প্রান্তিক ও গরীব গফুরের পক্ষে মহেশের প্রয়োজনীয় খড়ের জোগান দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। ব্রাহ্মণ তর্করত্নের কাছে গফুর ব্যক্ত করে-

> *"বিঘে চারেক জমি ভাগে করি, কিন্তু উপরি উপরি দু'সন অজন্মা- মাঠের ধান মাঠে শুকিয়ে গেল- বাপ বেটিতে দুবেলা দুটো পেট ভরে খেতে পর্যন্ত পাইনে। ঘরের পানে চেয়ে দেখ, বিস্টি-বাদলে মেয়েটাকে নিয়ে ঘরের কোণে বসে রাত কাটাই, পা ছাড়িয়ে শোবার ঠাঁই মেলে না। তাকিয়ে দেখ, পাঁজরা গোণা যাচ্ছে, - দাও না ঠাকুরমশাই, কাহন দুই ধার, গরুটাকে দুদিন পেটপুরে খেতে দিই।।... আমরা না খেয়ে মরি ক্ষেতি নেই, কিন্তু ও আমার অবলা জীব-কথা বলতে পারে না, শুধু চেয়ে থাকে, আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।"*[১০]

কিন্তু কেউ কথা শোনেনি গফুরের, কাহন দুই খড় ধারের পরিবর্তে জুটেছে তর্করত্নের গঞ্জনা-'যেমন চাষা, তার তেমনি বলদ।'গঞ্জনা সত্ত্বেও মহেশের প্রতি গফুরের ভালোবাসা একদম কমে না, বরঞ্চ ভালোবাসা আরও প্রগাঢ় হয়-

> *"মহেশ, তুই আমার ছেলে, তুই আমাদের আট সন প্রিতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস, তোকে আমি পেটপুরে খেতে দিতে পারি নে- কিন্তু তুই ত জানিস, তোকে আমি কত ভালোবাসি।"*[১১]

একদিকে মহেশের প্রতি ভালোবাসা অন্যদিকে নিত্যনৈমিত্তিক অভাব এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে গফুর বিচলিত। তার উপর রয়েছে সামাজিক অবহেলা, জমিদারের অত্যাচার, সামাজিক মেরুকরণের অভিশাপ। জমিদার পয়সার লোভে জমা বিলি করে দিয়েছে, অনেকে গফুরকে বলেছে মহেশকে বেঁচে দিতে, কিন্তু পারেনি গফুর। মানুষ অভাব বুঝতে

পারে, কিন্তু মহেশ পারেনি। দমন করতে পারেনি তার স্বাভাবিক ক্ষুধাকে। মানিক ঘোষের বাগানে ঢুকে সে গাছপালা খেয়েছে, পরিণতিতে মানিক ঘোষেরা তাকে খোয়ারে দিয়েছে। মহেশকে খোয়ার থেকে বার করতে গফুর নিজের পিতলের থালাটিও বন্ধক দিয়েছে। সাধারণ বিরক্তিবোধ ও অভাবে একসময় গফুর ঠিক করে মহেশকে সে বিক্রি করে দেবে। ক্রেতাও এসেছে, দশ টাকা দিয়ে দরদামও ঠিক হয়েছে কিন্তু মহেশকে নিয়ে যাবার সময়ই বেধেছে গোলযোগ, গফুরের অস্বাভাবিক আচরণে –

> *''যে দুইজন লোক সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা গরুর দড়ি খুলিবার উদ্যোগ করিতেই কিন্তু সে অকস্মাৎ সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া উদ্ধতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দড়িতে হাত দিয়ো না বলছি-খবরদার বলছি, ভালো হবে না।''*[১২]

গল্পে ট্রাজেডি সংগঠিত হয়েছে তৃতীয় পর্বে। জ্যৈষ্ঠ মাসের তীব্র দাবদাহে গফুরের জ্বর এসেছিল। অভাবে সে এখন জনমুজুরে পরিণত হয়েছে। এমনই এক কর্মহীন দিনে সে মেয়ে আমিনার কাছে ভাত চেয়েছিল, পায় নি, কারণ ঘরে নিত্যঅভাব, জল চেয়েছে সে মেয়ের কাছে মেয়ে দিতে পারেনি, কারণ সমাজে জাতপাত সমস্যা-

> *''গ্রামে যে দুই তিনটা পুষ্করিণী আছে তাহা একেবারে শুষ্ক। শিবচরণবাবুর খিড়কীর পুকুরে যা একটু জল আছে তা সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ে মাঝখানে দু একটা গর্ত খুঁড়িয়া যাঁহা কিছু জল সঞ্চিত হয় তাহাতে যেমন কাড়াকাড়ি তেমনি ভিড়।''*[১৩]

সেকারণেই হয়তো আমিনা খাবার জল সংগ্রহ করতে পারেনি। এসব কথা গফুরের মনে আসেনি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তার মাথার ঠিক ছিল না। এরই মাঝে জমিদার পেয়াদার তলব "বাবুর হুকুম জুতো মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে।"[১৪] কারণ মহেশ জমিদারের প্রাঙ্গণে ফুল গাছ খেয়েছে, ধান নষ্ট করেছে, জমিদারের মেয়েকে ফেলে দিয়েছে সর্বোপরি গফুরের সেই উদ্ধত উক্তি-"মহারাণীর রাজত্বে কেউ কারো গোলাম নয়। খাজনা দিয়ে বাস করি, আমি যাবো না।"[১৫] এরই ফলশ্রুতিতে জমিদার বাড়িতে পেয়াদার হাতে গফুরকে মার খেতে হয়েছে। ক্রুদ্ধ, ও ক্ষুব্ধ গফুর উন্মাদ হয়েছে যখন সে দেখতে পেয়েছে তৃষ্ণার্ত মহেশ আমিনাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা বিক্ষিপ্ত ভাঙ্গা ঘটের জল মরুভূমির মত শুষে নিচ্ছে। এই দৃশ্যই গফুরকে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য করে তুলেছে। পরিণতিতে লোহার লাঙ্গল দিয়ে গফুর মহেশকে আঘাত করেছে, যে মহেশকে সে সন্তানের মতো ভালবাসে।

> *''একটিবার মাত্র মহেশ মুখ তুলিবার চেষ্টা করিল, তাহার পরেই তাহার অনাহার ক্লিষ্ট শীর্ণ দেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। চোখের কোণ বাহিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু ও কান বাহিয়া ফোঁটা কয়েক রক্ত গড়াইয়া পড়িল। বার-দুই সমস্ত শরীরটা তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তার পরে সম্মুখ ও পশ্চাতের পা-দুটো তাহার যতদূর যায় প্রসারিত করিয়া দিয়া মহেশ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।''*[১৬]

গল্পটির শিল্পকুশলতা এখানেই ব্যক্ত হয়েছে। একটি আকস্মিক কারণে ট্রাজেডি নেমে এসেছে গফুরের জীবনে। মহেশের প্রতি গফুরের ভালোবাসার খামতি ছিল না। গো হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করতে শেষপর্যন্ত গফুর নিজের শেষ সম্বল ভিটেমাটি, তার খাওয়ার পিতলের থালা ও জল খাওয়ার ঘটি রেখে গিয়েছে। শুধু একটি প্রার্থনা করেছে ঈশ্বরের কাছে-

> *''নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিও, কিন্তু মহেশ তোমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করো না।''*[১৭]

পশুপ্রেমমূলক আর একটি গল্পের সন্ধান আমরা পাই লেখক রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরাম রচিত 'লম্বকর্ণ' নামক গল্পে। গল্পটিতে একটি ছাগলকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। গল্পটিতে লেখক পশুপ্রেমের মোড়কে অনাবিল হাস্যরসের উন্মোচন করেছেন। গল্পের শুরুতেই রায় বংশলোচন ব্যানার্জি বাহাদুর জমিদার অ্যান্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বিকালে খালের ধারে একটি ছাগলের সাক্ষ্যাৎ ঘটে। স্ত্রীর প্রতি ভয় থাকা সত্ত্বেও, সেই ছাগলকে তিনি নিজের বাড়ি নিয়ে আসেন-

> *"একটা পাঁঠা পুষিবেন তাতে কার কি বলার আছে? তাঁর কি স্বাধীনভাবে একটা শখ মিটাইবার ক্ষমতা নাই? তিনি একজন মান্যগণ্য সভ্রান্ত ব্যাক্তি, বেলেঘাটা রোডে তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বিস্তর ভুসম্পত্তি। তিনি একজন খেতাবধারী অনারারি হাকিম, - পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, এক মাস পর্যন্ত জেল দিতে পারেন। তাঁহার কিসের দুঃখ, কিসের লজ্জা, কিসের নারভেস্‌নেস? বংশলোচন বার বার মনকে প্রবোধ দিলেন- তিনি কাহারও তোয়াক্কা রাখেন না।"*[১৮]

সাহস করে তিনি নব আবিষ্কৃত পাঁঠাটিকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। মজলিশি আড্ডার বন্ধুগণ পরামর্শ দিলেন পাঁঠাটির কালিয়া হোক, তবে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হবে। কিন্তু বংশলোচনবাবু তাতে রাজী হলেন না। পাঁঠার নামকরণ করা হল লম্বকর্ণ।ক্রমে পাঁঠাটির অত্যাচারে বাড়ীর লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। স্ত্রী মানিনীর সাথে একপ্রস্থ মনোমালিন্যও হয়ে গেছে। তিনি শোবার ঘর ছেড়ে বৈঠকখানায় আশ্রয় নিলেন। কিন্তু পাঁঠাটির অত্যাচার এতটাই বাড়বাড়ন্ত হয়ে উঠেছে যে, তিনি পাঁঠাটিকে বেলেঘাটা কেরোসিন ব্যান্ডের ব্যান্ড মাষ্টার লাটুবাবুর হাতে তুলে দিলেন। শর্ত তিনি এক্টাই রাখলেন "ছাগলটিকে আপনি যত্ন করে মানুষ করবেন, বেচতে পারবেন না, মারতে পারবেন না।"[১৯] লাটুবাবু রাজী হয়ে নিয়ে গেলেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই লাটুবাবু ফিরে বংশলোচন বাবুর বাড়ী ফিরে এলেন। কারণ লম্বকর্ণ লাটুবাবুর ব্যান্ডের ঢোলের চামড়া কেটেছে, ব্যায়লার তাঁত খেয়েছে, হারমনিয়ার চাবি সমস্ত চিবিয়েছে।আর তাঁর পাঞ্জাবির পকেটে থাকা নব্বই টাকার নোটও চিবিয়েছে। এত কিছু শোনার পর বংশলোচনকে একশ টাকার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে। লম্বকর্ণকে নিয়ে আরও মুশকিলে পড়লেন বংশলোচন। ঠিক করলেন প্রভাতে যেখান থেকে তিনি লম্বকর্ণকে পেয়েছেন সেখানেই পুনরায় তাকে রেখে আসবেন। যথারীতি লম্বকর্ণকে সেখানেই রেখে তিনি লম্বকর্ণের গলায় একটি কাগজ টিনের কৌটায় বেঁধে দিলেন। কাগজে তিনি লিখলেন-"এই ছাগল বেলেঘাটার খালের ধারে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম, প্রতিপালন করিতে না পারায় আবার সেইখানেই ছাড়িয়া দিলাম। আল্লা কালী যিশুর দিব্য ইহাকে কেহ মারিবেন না।"[২০] ফেরার পথে দুর্যোগে বংশলোচন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। এই দুর্যোগে তাকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছে একমাত্র লম্বকর্ণই। লম্বকর্ণের সেই কাহিনী বংশলোচন শুনতে পান স্ত্রী মালিনীর বক্তব্যে-"ও বেচারা বৃষ্টি থামতেই ফিরে এসে তোমার খবর দিয়েছে। তাইতেই তোমায় ফিরে পেলুম। ওঃ, হরি মধুসূদন।"[২১]

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম কথাকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালাপাহার' ছোটগল্পটিতেও পশুপ্রেম বর্ণিত হয়েছে। একথা বলাইবাহুল্য যে, শিল্পি তারাশঙ্কর ছিলেন রাঢ় বাংলার অন্যতম কথাকার। রাঢ়ের জীবনযাত্রা তাঁর লেখনীতে প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থগুলিতে লিখেছেন যে, তিনি মানুষের পরিচয় নিতে চান, মানুষকে জানতে চান। আর সে কারণেই বিচিত্র ধরণের মানুষের খোঁজ পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। মানুষের পাশাপাশি তিনি মানুষ ও প্রাণীর প্রেমকে গল্পের বিষয়বস্তু করে তুলেছেন আলোচ্য 'কালাপাহাড়' গল্পে। কালাপাহাড় নামের মহিষ এক জীবন্ত চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। গল্পের কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই রংলাল নামের একজন গৃহস্থ সম্পন্ন চাষি খুঁজে ফেরে একজোড়া বলদ। যে বলদ দিয়ে সে চাষ করবে, আর তা দিয়ে সোনা ফলাবে মাটিতে। প্রথমদিকে রংলালের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে তার নব্য শিক্ষিত পুত্র যশোদানন্দন। অর্থের টানাটানিও রংলালকে তাঁর ইচ্ছা থেকে টলাতে পারে না। সুরহা হয় বউয়ের গয়না দিয়ে। হাট গিয়েছিল সে বলদ কিনবার বাসনা নিয়ে, কিন্তু হাটে গিয়ে তাঁর নজরে পরে যায় একজোড়া মহিষের উপর। স্বাস্থ্যবান মহিষ দুটি নজরে আসা মাত্র রংলালের কল্পনায় ভেসে উঠে হাল চাষের চিত্র। শেষপর্যন্ত একশ আটানব্বই টাকায় মহিষজোড়া কেনে রংলাল। মহিষ কেনায় বাড়ীর লোক খানিকটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, কিন্তু রংলাল তাঁর স্বীয়আনন্দে মশগুল। একটার নাম রাখে কালাপাহাড় ও অপরটির নাম রাখে কুম্ভকর্ণ। সবই ঠিকঠাক চলছিল, কিন্তু রংলালের জীবনে নেমে আসে এক অভাবিত দুর্ঘটনা। রংলাল নদীর চরে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণকে চড়াতে নিয়ে গেলে সেখানে বাঘের অতর্কিত আক্রমণ হয় রংলালের উপর। মালিক রংলালের প্রতি ভালবাসার দরুন কুম্ভকর্ণ ও কালাপাহাড় বাঘের এই অতর্কিত আক্রমণের উপযুক্ত জবাব দেয়। বাঘের সাথে লড়াই করে কুম্ভকর্ণ গুরুতর আহত হয়, ক্রমে বাঘের সাথে সেও মৃত্যুর কলে ঢলে পরে। একলা হয়ে যায় কালাপাহাড়, সাথীহীন জীবন ক্রমশ কালাপাহাড়কে আক্রমণাত্মক করে তুলেছিল। একবার রংলাল একটি নতুন মহিষকে কিনে এনেছিল কালাপাহাড়ের সাথী করার জন্য। কিন্তু কালাপাহাড় সেই মহিষকে সাথী মনে করেনি, তাকে মেরে ফেলেছে। এহেন বিষময় অবস্থায় কালাপাহাড়কে বিক্রি করে দেওয়া

ছাড়া রংলালের আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু রংলালকে ছেড়ে কালাপাহাড় থাকতে পারবে না। একবার রংলাল তাকে বিক্রি করে দিলে সে পুনরায় রংলালের বাড়িতেই ফিরে এসেছে। ক্রমশ বিরক্ত হয়ে রংলাল গ্রামের থেকে দূরের হাটে কালাপাহাড়কে বিক্রি করে দিয়েছে। কালাপাহাড়ে ভাবনাকে লেখক খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন-

> *"সে রংলালকে খুঁজিতেছিল। কিন্তু কই- সে কই? পাইকারটা লাঠি দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া তাড়া দিল, চল্ চল্।*
> *কালাপাহাড় আবার ডাকিল, আঁ- আঁ-আঁ।*
> *সে খুটি পাতিয়া দাঁড়াইল, যাইবে না।*
> *পাইকারটা আবার তাহাকে আঘাত করিল। কালাপাহাড় পাগলের মত চারিদিকে রংলালকে খুঁজিতেছিল।*
> *কই, সে কই? নাই, সে তো নাই।*
> *কালাপাহাড় দুর্দান্ত টানে পাইকারের হাত হইতে আপন গলার দড়ি ছিনাইয়া লইয়া ছুটিল।"*[২২]

এই ছোটাই কালাপাহাড়ের কাল হল, চলতি হাট বাজারে কালাপাহাড়ের উন্মত্ততাই পুলিশ সাহেবকে গুলি করতে বাধ্য করেছে, নির্মম ভাবে তাকে মরতে হয়েছে। 'আঁ – আঁ- আঁ' এই তিনটি শব্দের মধ্য দিয়েই লেখক মানুষ ও পশুর ভালবাসাকে দর্শিত করেছেন।

মানুষ ও প্রাণীর মেলবন্ধনের কথা পাওয়া যায় তারাশঙ্কর বন্ধ্যোপাধ্যায়ের রচিত নারী ও নাগিনী নামক গল্পেও। গল্পের প্রধান চরিত্রগুলি হল খোড়া শেখ, জোবেদা, ও উদয়নাগ সাপিনী। উদয়নাগ কোন মানব চরিত্র নয়, একটি সাপ কিন্তু নিজের অস্তিত্বে সে তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে। খোড়া শেখ পেশায় সাপের ওঝা। সাপ নিয়ে সে খেলা করে। সাপের ওঝা বা বাজিকর পেশায় তার দিন অতিবাহিত হতে চায় না। সংসার চালাতে তাকে মাঝে মধ্যে মজুরিও খাটতে হয়। জোবেদা তার স্ত্রী। সুখের সংসারে তাদের দিন কোনরকমে চলে যায়। কিন্তু হঠাৎ একদিন খোরা শেখ ইটের পাজরে একটি উদয়নাগের শিশু রূপ দেখে মোহিত হয়ে যায়। এই শিশু সাপিনীকে সে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। এরপরেই সেই সাপিনীর প্রতি খোরা শেখের প্রেম জেগে উঠে। একটি সাপের প্রতি একজন মানুষের প্রেম। ঘটনাক্রমে ছয় মাস অতিবাহিত হয়। খোড়া শেখ সাপিনীর জন্য একটি মিনি নিয়ে আসে। যেমন করে একজন স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসায় তার জন্য উপহার নিয়ে আসে তেমনি সাপিনীর জন্য খোড়া শেখ নিয়ে আসে মিনি। এই প্রেমেই তার স্ত্রী জোবেদার ঈর্ষার কারণ। জোবেদা সাপিনীকে নিজের সতীনের মতো দেখে। কারণ খোড়া শেখের ভালোবাসার অনেকটাই চলে যায় সাপিনীর প্রতি। অন্যদিকে সাপিনীও জোবেদাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে। একসময় খোড়া শেখ সাপিনীকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসে, কিন্তু সাপিনী আবার ফিরে আসে তার বাড়িতে। জোবেদা ঘুটে দিয়ে সাপিনীকে মারে, প্রতিশোধকল্পে সাপিনীও সেই রাত্রে জোবেদাকে কামড়ে দিয়ে যায়। স্ত্রীর প্রতি গভীর প্রেম থাকার দরুন খোড়া শেখ উচ্চারিত করে যদি জোবেদা না বাঁচে, তবে সাপিনীও বাঁচবে না। জোবেদার মৃত্যু হয়েছে, সেই অনুযায়ী সাপিনীকে হত্যা করার কথা ছিল খোড়া শেখের, কিন্তু পরবর্তীতে তা আর হয়ে উঠেনি। খোড়া শেখ সাপিনীর প্রতি ভালবাসায় তাকে হত্যা করতে পারেনি। আলোচ্য গল্পে ঈর্ষাই প্রধান রূপে দেখা দিয়েছে। যার প্রমাণ আমরা পাই গল্পের শেষে খোড়া শেখের স্বীকারোক্তিতে-" শুধু তার দোষ কি, মেয়ে জাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।"[২৩]

সৈয়দ মুজতবা সিরাজের 'গোঘ্ন' গল্পটি পশুপ্রেমের এক বলিষ্ঠ উদাহরণ। গল্পের কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই গাড়োয়ান হারাই বাঘেরি অঞ্চলের বাসিন্দা। রোজ শীতে তাঁরা রাঢ় অঞ্চলে আসে ধানের জন্য। চারু মাষ্টারের মেয়ের বিয়েতে সে বড়ভাই এর কথা রক্ষা করার জন্য কুমড়ো ও কলাই নিয়ে আসে চারু মাষ্টারের বাড়িতে। ফেরার পথে তার গাড়ির দুটো গরুর মধ্যে একটি গরু অসুস্থ হয়ে পড়ে। চারু মাষ্টার বিদায়কালে হারাইকে বলে অসুস্থ গরুটিকে কবিরাজ পরিমল বৈদ্যকে দেখাতে। পরিমল বৈদ্যর ওষুধ খেয়েও ধনা(গল্পে উল্লেখিত গরু) সুস্থ হয়ে উঠে না। বাকী পথ কিভাবে যাবে এই প্রশ্নই হারাইয়ের মাথায় দুঃশ্চিন্তা বয়ে নিয়ে আসে। শেষে নিজেকেই গরুর জোয়াল টানতে হয়। মেদীপুরের পথে রাতের অন্ধকারে দেখা হয় গরুর পাইকার দিলজানের সঙ্গে। দিলজান হারাইকে জানায় তার এই অসুস্থ গরু বেশিক্ষণ টিকবে না। এই সুযোগে সে ধনাকে কিনে নিতে চায়। প্রলোভন দেখায় হারাইকে। ৫০ টাকার বিনিময়ে এই গরু দিলজান কিনে নিতে চায়। সেইসঙ্গে হারাইকে জানায় যেহেতু সে

জাতভাই, তাই এই গরু মানুষের ভোগে লাগুক। দিলজানের কথা শুনে হারাই চমকে উঠে। সন্তানতুল্য ধনাকে সে কখনো একজন কসাইয়ের হাতে তুলে দেবে না। রাগান্বিত হয়ে দিলজানকে সে চলে যেতে বলে।

এই দিলজানকেই আবার পাওয়া যায় মেদীপুরের হাটে। সেদিন ছিল মেদীপুরের হাট। রাত্রিটুকু কোনরকমে কাটে হারাইয়ের। সকাল সকাল সে এসে পৌঁছয় মেদীপুরের হাটে। তার গরুর অবস্থা দেখে সবাই তাকে গরুটি বিক্রি করার পরামর্শ দেয়। কিংকর্তব্যবিমুঢ় হারাই ধনাকে বিক্রি করে দেয় দিলজানের কাছে। এরপর হারাইের সাথে সাক্ষ্যৎ হয় পুণ্যাত্মা বদর হাজির। বদর হাজি হারাইকে রাত্রিটুকু তার আশ্রয়ে থাকার আমন্ত্রণ জানান। সেখানে অন্যান্য বাঘারি গাড়োয়ানদের সাথে হারাইয়ের খানাপিনার ব্যবস্থা করে বদর হাজি। নৈশভোজে গাড়োয়ানদের পাতে তুলে দেওয়া হয় গরুর মাংস। এই মাংস হারাই মুখে তোলার সময় বদর হাজি ও মৌলবির কথোপকথনে জানতে পারে এই মাংস কেনা হয়েছে দিলজানের থেকে।হারাইয়ের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মাংস সে মুখে তুলেছে তা আসলে তার আদরের সন্তানতুল্য ধনার। ক্ষোভে, ঘৃণায়, সে ফেটে পড়ে। তার এই ঘৃণা দেখে বদর হাজি ও অন্যান্য গাড়োয়ানরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। গল্প শেষ হয়েছে হারাইয়ের ভাঙ্গা গলার চিৎকারে-

> ‘‘হেই হাজি সাব! আমাকে হারাম খাওয়ালেন!
>
> ...
>
> হারাই কথা কানে নেয় না। বারান্দা থেকে নিচে নেমে রাতের আবহমণ্ডল এফোঁড় ওফোঁড় করে বলে- হামাকে হামার বেটার গোশতো খাওয়ালেন! হেই হাজিসাব ! হামার ভেতরটা জ্বলে খাক হয়ে গেল গে ! এক –পদ্মার পানিতেও ই আগুন নিভবে না গো।’’[২৪]

গল্পটির শেষে হারাইয়ের বেদনার্ত উক্তিতেই গল্পটি রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য গল্পগুলিতে পশুপ্রেমের আড়ালে একদিকে বর্ণিত হয়েছে সমাজের বীভৎসতা, অন্যদিকে নরনারীর সম্পর্কের জটিলতা উন্মচিত হয়েছে। আমরা মহেশ গল্পে পেলাম প্রান্তিক মানুষের জীবনের ছায়াছবি, যেখানে সমাজের প্রতাপ প্রবল। অন্যদিকে ‘নারী ও নাগিনী’ গল্পতে রয়েছে সাধারণ নরনারীর সম্পর্কের জটিলতা ও ঈর্ষা। ‘কালাপাহাড়’, ‘আদরিনী’ ও ‘লম্বকর্ণ’ গল্প তিনটিতে যে বাৎসল্য রসের পরিচয় পাওয়া যায় তা এককথায় অনির্বচনীয়।

তথ্যসূত্র:

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, এস. বি.এস পাবলিকেশন, কলকাতা-৭০০০০৯,প্রথম প্রকাশ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ১৯৫
২) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯৮
৩) চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ সম্পাদনা, প্রভাতকুমারের শ্রেষ্ঠগল্প, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলিকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ. পৃষ্ঠা-৩
৪) তদেব,পৃষ্ঠা- ৭
৫) তদেব,পৃষ্ঠা- ৯
৬) তদেব,পৃষ্ঠা- ১০
৭) তদেব পৃষ্ঠা- ১০
৮) তদেব পৃষ্ঠা- ১০
৯) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার সম্পাদনা, বাংলা গল্পসংকলন প্রথম খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমি, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ. পৃষ্ঠা- ১২১
১০) তদেব পৃষ্ঠা- ১২২
১১) তদেব পৃষ্ঠা- ১২৩
১২) তদেব পৃষ্ঠা- ১২৫
১৩) তদেব পৃষ্ঠা- ১২৬

১৪) তদেব পৃষ্ঠা- ১২৭
১৫) তদেব পৃষ্ঠা- ১২৭
১৬) তদেব পৃষ্ঠা- ১২৭
১৭) তদেব পৃষ্ঠা- ১২৮
১৮) বসু, রাজশেখর, একালের ছোটগল্প সঞ্চয়ন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৭০০০৭৩, প্রথমসংস্করণ ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা-৩
১৯) তদেব, পৃষ্ঠা- ৮
২০) তদেব, পৃষ্ঠা- ১২
২১) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪
২২) ভট্টাচার্য, জগদীশ সম্পাদনা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৭৩
২৩) তদেব, পৃষ্ঠা-৬৪
২৪) সিরাজ, সৈয়দমুজতবা, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথমপ্রকাশ ২০০৭. মুদ্রণ, পৃষ্ঠা- ৬৭

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১) বসু, রাজশেখর, পরশুরাম গল্পসংগ্রহ, এন.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম সংস্করণ প্রকাশ ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ. মুদ্রণ